পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা

২৩-২৪ জুলাই ২০১০, জেলা ক্রীড়া সংস্থা সম্মেলন কক্ষ, রাঙ্গামাটি
আয়োজনে : পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও ভূমি অধিকার আন্দোলন, কাপেং ফাউন্ডেশন এবং খাগড়াছড়ি হেডম্যান সমিতি
সহায়তায় : ভলান্টিয়ার্স সার্ভিসেস ওভারসিস (ভিএসও)

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার সমাধানের উপায়

মঙ্গল কুমার চাকমা, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

ক. ভূমিকা

যদিও পার্বত্য চট্রগ্রামের আয়তন সমগ্র বাংলাদেশের এক-দশমাংশ কিন্তু নিবিড় চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। অধিকন্তু ১৯৬০ সালে কাপ্তাই নির্মিত হওয়ার ফলে প্রথম শ্রেণী আবাদী জমির ৪০ শতাংশ (৫৪ হাজার একর জমি) এই বাধেঁর পানিতে তলিয়ে যায়। আবাদী জমির স্বল্পতার কারণে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়নি ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজ করছে শত শত ভূমিহীন পরিবার। কিন্তু সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর আবাদযোগ্য জমি রয়েছে এই প্রতারণামূলক অজুহাত দেখিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সাল থেকে দেশের সমতল জেলাগুলো হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে চার লক্ষাধিক বহিরাগত লোক এবং তাদেরকে বসতি দেয়া হয় জুম্মদের ভোগ দখলীয় ও রেকর্ডীয় জমির উপর। পাশাপাশি সেটেলাররা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক তৎপরতার মাধ্যমে জুম্মদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের জমিগুলো বেদখল করে নেয় পাইকারীভাবে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় একটি জলন্ত অগ্নিকুন্ড।

১৯৬৪-৬৬ সনে কানাডার ফরেষ্টল ফরেষ্ট্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারন্যাশন্যাল লিমিটেড এর ভূমি জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের চাষযোগ্য ধান্য জমির ('এ' শ্রেণীভূক্ত) পরিমাণ মাত্র ৩.১% তথা ৭৬,৪৬৬ একর। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা যদি সরকারী উদ্যোগে বসতি প্রদানকারী রাজনৈতিক অভিবাসীদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আদিবাসী জুম্ম ও পুরোনবস্তী স্থায়ী বাঙ্গালী মিলে একত্রে ৯ লক্ষ স্থায়ী অধিবাসী ধরা হয় তাহলে তাদের মধ্যে মাথাপিছু ধান্য জমির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ০.০৮ একর। এছাড়া এর সাথে 'বি' শ্রেণীভূক্ত ঢালু জমিগুলো (মোট ৬৭,৮৭১ একর) যদি একত্র করলে মোট ভূমির পরিমাণ দাড়াঁয় ১৪৪,৩৩৭ একর যা ৯ লক্ষ লোকের মাথাপিছু জমির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ০.১৬ একর (ধানী ও ঢালু জমি মিলে)। অথচ সমগ্র বাংলাদেশেও মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.২০ একর। অপরদিকে এই দুই প্রকার জমির সাথে যথাক্রমে আরো উদ্যান চাষোপযোগী 'সি' শ্রেণীভূক্ত জমি (মোট ৩,৬৬,৬২২ একর) ও বন বাগান উপযোগী 'সি-ডি' শ্রেণীভূক্ত জমি (মোট ৩২,০২৮ একর) একত্রে ধরা হয় তাহলে জমির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৫৪২,৯৮৩ একর এবং ৯ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে প্রতি পরিবারে ৫ জন জনসংখ্যা হিসেবে মোট ১৮০,০০০ পরিবারের পরিবার পিছু জমি পড়ছে ৩.০ একর (পাহাড় ও ধান্য জমি মিলে) - যা একটি পরিবারের ভরণ-পোষনের জন্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জমি দেশের সমতল জমির মতো উর্বর ও বহু ফসলী নয়।

খ. ভূমি সমস্যা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাকে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে কয়েকটি বিশেষ মৌলিক বিধান রাখা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠন করে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি করার বিধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, উক্ত কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির বিধান করা হয়েছে। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে-

- ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত করার বিধান করা হয়েছে।
- হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।
- কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর এবং অধিগ্রহণ করা যাবে না।

- জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকবে।
- "সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ" বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের বিধান করা হয়।
- সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করার বিধান করা হয়।
- প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ করার বিধান করা হয়।

গ. ভূমি সমস্যা সমাধানের উপায়

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যে নিহিত রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি। অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর এক যুগের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষ করে চুক্তির ভূমি বিরোধ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধানাবলী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আগে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে পূর্বের মতো পাহাড়ীদের তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করে ভূমি জবরদখল, সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিতকরণ, নানা অজুহাতে বা নানা প্রকল্পের নামে অধিগ্রহণ, আইন লঙ্ঘন করে অস্থানীয়দের নিকট অব্যাহতভাবে ইজারা প্রদান ইত্যাদির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি সমস্যা আরো বেশী জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজতে হচ্ছে। নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কোন কোন বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কি কি আশু পদক্ষেপ নিতে হবে তা উল্লেখ করা গেল-

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করতে হবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন জাতীয় সংসদে পাশ করে। কিন্তু এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই সংসদে পাশ করা হয়। ফলে উক্ত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কমিশনের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আইনের ৭(৫) ধারায় বলা হয়েছে যে- 'চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬(১) ও বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভূক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে'। এ বিধান বলে কমিশনের অন্যান্য সদস্যদেরকে রাবার ষ্টাম্পে পরিণত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে চেয়ারম্যানকে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান করা হলেও ভূমি কমিশনের উক্ত আইনের ৬নং ধারায় কমিশনের কার্যাবলীতে (১)(ক) উপ-ধারাতে কেবলমাত্র 'পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধ' নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে। ফলে ২০ দফা চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত শরণার্থী ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের জমি বিরোধসহ অন্যান্য সকল ভূমি বিরোধ অনিষ্পত্তিই থেকে যাবে। আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু পাহাড়ী পরিবারের সংখ্যা এক লক্ষাধিক। তাদের অধিকাংশের জমি সেটেলারদের বেদখলে। তাদের জমিগুলো যদি ফেরৎ না পায় কিংবা ভূমি বিরোধগুলো যদি নিষ্পত্তি না হয় তাহলে ল্যান্ড কমিশনের কার্যক্রম হয়ে পড়বে অন্তসারশূণ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত 'আইন, রীতি ও পদ্ধতি' অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও আইনের ৬(১)(খ) ধারায় কেবলমাত্র 'আইন ও রীতি' উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া চুক্তিতে 'ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি)' এর বিরোধগুলোর ক্ষেত্রেও কমিশন নিষ্পত্তি করবে বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রণীত কমিশন আইনে জলেভাসা জমির কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। অথচ কাপ্তাই হ্রদের শত শত পরিবারের জমি এখন সেটেলারদের দখলে। এই জমিগুলো বংশ পরম্পরায় পাহাড়ীরা চাষাবাদ করে আসছিল।

উক্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে ১৯ দফা সম্বলিত সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। উক্ত সুপারিশমালা বিবেচনার্থে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ১২ মার্চ ২০০২ তৎকালীন আইনমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় আঞ্চলিক পরিষদের

সুপারিশ মোতাবেক ভূমি কমিশন আইনের সংশোধন করার ঐকমত্য হয়। তদনুসারে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ভেটিং হয়ে যাবার পর উক্ত ভূমি কমিশন আইন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। এরপর আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এ বিষয়ে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি।

পুনরায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উক্ত বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য গত ৭ মে ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে সরকারের নিকট পুনরায় সুপারিশমালা প্রেরণ করা হয় [পরিশিষ্ট-১]। এলক্ষ্যে গত ২৬ আগষ্ট ২০০৯ আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাথে ভূমি মন্ত্রী রেজাউল করিম হীরার সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অনেকটা বিধি-বহির্ভূতভাবে তিন পার্বত্য জেলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদেরও ডাকা হয়। উক্ত সভায় আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবের অনুকূলে মত দিলেও রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এসব সংশোধনীর চরম বিরোধীতা করতে থাকে। এক পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা স্থগিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের কর্তকর্তাদের এরূপ মতামত নেয়ার নজির অভূতপূর্ব। অধিকন্তু আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং হয়ে যাবার পর এরূপ নতুন করে মতামত নেয়াও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

এলক্ষ্যে পুনরায় ৬ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে ভূমি মন্ত্রী রেজাউল করিম হীরার সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায়ও চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। ফলে এখনো ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের বিষয়টি অনিশ্চিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

২. ভূমি কমিশনের অফিস শক্তিশালীকরণ ও স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্য থেকে জনবল নিয়োগ করতে হবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কার্যালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার মধ্য থেকে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগদান করা অতীব জরুরী। উল্লেখ্য যে, ২০০৬ সালে কমিশনের কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলেও তা পরবর্তীতে বাতিল করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পরিসম্পদ বরাদ্দ এবং কমিশনের জন্য কার্যালয় স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয় এখনো অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে কমিশনের কার্যালয় শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পরিসম্পদ বরাদ্দ এবং কার্যালয় স্থাপন করা আশু জরুরী।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদনার্থে এই বিধিমালা প্রণয়ন করা অতীব জরুরী। বিধিমালায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দরখাস্ত দাখিল ও তদন্ত প্রক্রিয়ার পদ্ধতি, ফরমেট এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি পদ্ধতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি পরিচিহ্নিত করতে হবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার বিধান করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, পার্বত্য অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা বরাবরই দেশের অপরাপর সমতল অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা হতে পৃথক। অনুরূপভাবে এ অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থাপনাও সমতল জেলাগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পার্বত্য চট্টগ্রামে মূলতঃ তিন ধরনের ভূমি রয়েছে। প্রথমতঃ বন্দোবস্তকৃত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূমি যা বেশীর ভাগই ধান্য জমি। দ্বিতীয়তঃ ভোগদখলীয় জমি যা বেশীর ভাগই বাস্তুভিটা, বাগানবাগিচা ইত্যাদির ভূমি। তৃতীয়তঃ রেকর্ডীয় বা ভোগদখলীয় কোনটাই নয় এমন ভূমি যা জুমভূমি নামে খ্যাত ও প্রথাগতভাবে সংশ্লিষ্ট মৌজা অধিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানাধীন। অর্থাৎ মৌজা এলাকায় অবস্থিত ভূমির মধ্যে ব্যক্তি নামে বন্দোবস্তকৃত বা ভোগদখলীয় ভূমি ব্যতীত অন্য সকল ভূমিই মৌজাবাসীর। রাজা-হেডম্যান-কার্বারীর নিয়ে গঠিত প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসব ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই মৌজার অধিবাসী যে কোন ব্যক্তি হেডম্যানের অনুমতি নিয়ে মৌজাস্থিত সমষ্টিগত মালিকানাধীন জমিতে জুম চাষ, গো-চারণ, গৃহস্থালী কাজে বনজ দ্রব্যাদি সংগ্রহ ইত্যাদির অধিকার রয়েছে। এজন্য জুমচাষীরা পরিবার ভিত্তিক জুম খাজনাও দিয়ে থাকে। জুমভূমি সমষ্টিগত মালিকানাধীন বিধায় জুম খাজনা জমি ভিত্তিক না হয়ে, মূলতঃ মাথাপিছু ভিত্তিক ক্যাপিটাশন ট্যাক্স হিসেবে ধার্য হয়ে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনব্যবস্থা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে এসেছে বিশেষ আইনের আওতায়। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের সংবিধানের আওতায় ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসন কাঠামো এবং আলাদা ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হয়েছে। এ শাসন কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধানাবলী অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অঞ্চল পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের উপর ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী অর্পণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ তা তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা মূলতঃ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯৯৮ সালের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন (সংশোধন), ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৩৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম বাজারফান্ড বিধিমালা প্রভৃতি বিশেষ আইন ও বিধিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অধিকন্তু এই অঞ্চলে রয়েছে রাজা-হেডম্যান-কার্বারীদের নিয়ে ঐতিহ্যবাহী প্রশাসন ব্যবস্থা যারা সরাসরি ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করা এবং প্রয়োজনে বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী।

৫. পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভূমি সংক্রান্ত বিধানাবলী কার্যকর করতে হবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ১৯৯৮ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়। আইন প্রণীত হলেও আইনের মৌলিক বিধানাবলী এবং আইন মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে ন্যস্ত বিষয়গুলো এখনো হস্তান্তর বা কার্যকর করা হয়নি। তাই অচিরেই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কার্যকর করা দরকার-

- ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ন্যস্ত করা।
- হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা।
- কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর এবং অধিগ্রহণ না করা।
- জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত করা।
- "সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ" বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা।

৬. ভূমিহীন পাহাড়ীদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান করতে হবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সরকার কর্তৃক ভূমিহীন বা দু' একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দু' একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার এখনো কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এ বিষয়ে অচিরেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

৭. ভূমি কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যানের একতরফা কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান জোট সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর গত ১৯ জুলাই ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়োগ প্রদান করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ লাভের পর চেয়ারম্যান মহোদয় গত ২৭ জানুয়ারী ২০১০ ভূমি কমিশনের একবার মাত্র আনুষ্ঠানিক সভা আহ্বান করেন।

উক্ত আনুষ্ঠানিক সভা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় ভূমি কমিশনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ভূমি জরিপ ঘোষণা, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির দরখাস্ত আহ্বান করে গণবিজ্ঞপ্তি জারী, তথাকথিত জেলা কমিশন নামে ভূমি কমিশনকে বিভক্তি, গণবিজ্ঞপ্তি ও আহ্বান প্রচারের নামে তিন জেলায় পদযাত্রা আয়োজন ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভূমি কমিশনের সদস্যদের সাথে বৈঠক না করে বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নানা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে এবং এর ফলে ভূমি বিরোধের ক্ষেত্রে নতুন জটিলতা ও অচলাবস্থা দেখা দিতে শুরু করেছে এবং ভূমি কমিশনকে অহেতুক প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত ভূমি জরিপসহ বিধি ও পদ্ধতি বহির্ভূত সকল সিদ্ধান্তাবলী অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ভূমি কমিশনের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনার্থে বর্তমানে চেয়ারম্যান পদে নিয়োজিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে অপসারণ করে অন্য একজন উপযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করার যে দাবী উঠেছে সে বিষয়টিও সরকারকে সক্রিয় বিবেচনায় নিতে হবে।

৮. অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ইজারা বাতিল করতে হবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে যে সকল অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে যারা লীজ পাওয়ার পর দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেননি বা জমি সঠিক ব্যবহার করেননি সে সকল জমির ইজারা বাতিল করার বিধান থাকলেও আজ অবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। আশি ও নব্বই দশকে মোট ১,৮৭১টি প্লট যার মোট ভূমির পরিমাণ

৪৬,৫৭৫ একর রাবার বা উদ্যান চাষের জন্য অস্থানীয় ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী ইজারার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া হয়। এসব বরাদ্দকৃত একটি প্লটও আজ অবধি বাতিল করা হয়নি। পক্ষান্তরে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বিশেষতঃ বান্দরবান জেলায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন করে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির স্বার্থে অচিরেই পূর্বের ইজারা বাতিল করতে হবে এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ইজারা প্রদান বন্ধ করতে হবে।

৯. অধিগ্রহণ বাতিল করতে হবে

সরকার একতরফাভাবে বনায়নের নামে ২,১৮,০০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র বান্দরবান জেলায় রয়েছে ৭২,০০০ একর জমি। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে সংখ্যালঘু ও সুযোগ বঞ্চিত খিয়াং জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশপরম্পরায় জুমচাষ ও বসতি করে আসা জমিতে পরবাসী হয়ে পড়েছে।

এছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে হাজার হাজার একর জমি সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই অধিগ্রহণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী তথা সরকার পক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। কেবলমাত্র বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৭৫,৬৮৬ একর ভূমি এখাতে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে জুম্ম অধিবাসী নিজ বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে এবং তাদের চিরায়ত জুম ভূমি হারিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এসব অধিগ্রহণ বাতিল বা পুনবিবেচনা করতে হবে।

৯. প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করতে হবে

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হলেও অধিকাংশ জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি। তাদের জায়গা জমি ও গ্রাম এখনো সেটেলারদের দখলে থাকায় তাদের পুনর্বাসন এখনো যথাযথভাবে হতে পারেনি। তাই প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে- (১) জুম্ম শরণার্থীদের ৪০টি গ্রাম সেটেলার বাঙালীদের জবরদখল হতে মুক্ত করা; (২) প্রত্যাগত ৯,৩২৬ শরণার্থী পরিবারকে তাদের জমিজমা ফেরৎ দেয়া; (৩) পুনর্বহালকৃত শরণার্থীদের (১৯৬ জন) অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং (৪) প্রত্যাগত শরণার্থীদের ব্যাংক ঋণ মওকুফ করা।

অপরদিকে আজ অবধি আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। আওয়ামীলীগ সরকার টাস্কফোর্সের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিত করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালীদেরও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে চরম জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে আভ্যন্ত রীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা এবং সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম পুনর্বাসন সরকারী উদ্যোগ বাতিল করা জরুরী।

১০. সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করতে হবে

তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির সাথে স্বৈরাচারী শাসনামলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের বিষয়টি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এসব সেটেলাররা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রেরই শিকার। তাদের দারিদ্রতা ও নদী ভাঙ্গনের ফলে ভাসমান জীবনের অসহায়ত্বকে ব্ল্যাক মেইল করে তৎকালীন স্বৈরশাসক নানা প্রলোভন দেখিয়ে সেনাবাহিনীর মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে। এই ছিন্নমূল অসহায় মানুষদেরকে স্ব স্ব জেলায় বা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি সমস্যার প্রকৃত সমাধান কঠিন হবে।

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটেলারসহ বহিরাগতদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ ও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এর ফলে ক্রমবর্ধমান হারে বহিরাগত অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং তাদের দ্বারা ভূমি বেদখল অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই ধারা অচিরেই বন্ধ করতে হবে এবং সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইবে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করতে হবে; এলক্ষ্যে- (ক) সেটেলার বাঙালীদের রেশন বন্ধ করা; (খ) সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়া এবং (গ) ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা দরকার।

ঘ. উপসংহার

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। এ সমস্যা সমাধানে যতই কালক্ষেপণ করা হবে ততই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হবার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি দিন দিন অবনতি হচ্ছে এবং উদ্বেগজনক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। তাই অচিরেই দেশের সামগ্রিক স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা দ্রুত সমাধান করা দরকার।•